ফয়সাল আহমেদ

বঙ্গবন্ধু ও সৈয়দ নজরুল বন্ধুত্বের তিন দশক

স্বাধীন বাংলাদেশ তথা ভারত উপমহাদেশের রাজনীতিতে বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকারের ভারপ্রাপ্ত ও উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের নাম অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে ও সম্মানের উচ্চারিত হয়। বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজকর্মগুণে নিজেকে বিশ্ব নেতায় পরিণত করেছিলেন। হয়ে উঠেছেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। ব্যক্তিজীবনের অপরিসীম আত্মত্যাগের কল্যাণেই তিনি আজ বাঙালির সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। সেই মহান মানুষটির অন্যতম প্রিয় ও বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। তাঁরা একই আদর্শ লালন করতেন। পাকিস্তান সরকারের নির্যাতন, নিষ্পেষণ থেকে পূর্ববাংলার মানুষদের মুক্ত করে একটি স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে শেষ পর্যন্ত তাঁরা তা সফলভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন। সঙ্গত কারণেই স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে এই দুজনের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। স্বাধীনতার প্রায় পঞ্চাশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও তাঁরা দুজনই প্রবলভাবে প্রাসঙ্গিক বাঙালির জাতীয় জীবনে। এই সময়ে বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে চলছে বাঙালি জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের শততম বার্ষিকী পালন উপলক্ষে 'বঙ্গবন্ধু বর্ষ' উদযাপনের আয়োজন। আর পাঁচ বছর পর উদযাপিত হবে তাঁরই বিশ্বস্ত রাজনৈতিক সহযোদ্ধা সৈয়দ নজরুল ইসলামের শততম বার্ষিকী।

প্রবন্ধ

যেভাবে পরিচয় দুজনের

১৯৪৭ সাল। চারদিকে তখন ভারতভাগ নিয়ে তুমুল আলোচনা চলছে। অন্যকিছু নয় শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতেই একটি দেশ ভেঙ্গে আরেকটি নতুন দেশের জন্মের ক্ষণ প্রায় চূড়ান্ত। ভারতবর্ষের অন্য অঞ্চলের মত বাংলার মানুষও ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির প্রহর গুণছে। কবে আসবে সেই দিন!। এমনই এক সময়ে বৃহত্তর সিলেট ভারত না পাকিস্তান কোন দেশের অন্তর্ভুক্ত হবে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে গণভোটের আয়োজন করা হয়। এ সময় পাকিস্তানের পক্ষে প্রচারণা চালাতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম একদল ছাত্র নিয়ে সিলেট যান। একই সময়ে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের তখনকার তুখোড় ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানও পাকিস্তানের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে সিলেট আসেন। সেখানেই ঘটে এই দুই উদীয়মান নেতার

পরিচয়। তারপর পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব। বন্ধুত্ব থেকে আজীবনের রাজনৈতিক সহকর্মী। এরপর লড়াই সংগ্রামে কিংবা ব্যক্তিজীবনে দুজনে হেঁটেছেন পাশাপাশি বন্ধুর মতো। পরিচয় থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় তিন দশকের পথচলায় কোনো আদর্শিক বিচ্যুতি নয়, কোনো স্বার্থগত দ্বন্দ্ব নয়, কেবল মৃত্যুই তাঁদের আলাদা করেছে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাঁর প্রিয় বন্ধু ও নেতার প্রতি জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন। এমনকি পনেরই আগস্ট ট্র্যাজেডির পরও তিনি নিজ আদর্শে অবিচল ছিলেন, অকাতরে নিজ প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছেন, তবু শত্রুদের সাথে হাত মেলাননি। সুযোগ যে আসেনি তা নয়, বরং অনেক সুযোগ এসেছিল তাঁর সামনে। কিন্তু কোনো কিছুতেই তিনি সাড়া দেননি। করেননি দল কিংবা আদর্শ বদল। বঙ্গবন্ধু আর আওয়ামী লীগেই নিজেকে বিলীন করে দিয়েছেন।

আইয়ুব সরকারের আমলেও মোনায়েম খান এবং এনএসএফ তাঁর পরিবারের ওপর বিভিন্ন রকমভাবে নির্যাতন চালিয়েছে। তবু তিনি তাঁর বিশ্বাস ও সিদ্ধান্তে অটল থেকেছেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে সামনে রেখে বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য, কল্যাণের কাজ করেছেন সাহসের সাথে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও বঙ্গবন্ধুর সম্পর্কটা যে খুবই আন্তরিক ছিল তার প্রমাণ আমরা বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলীর বক্তব্যে পাই- '১৩ই কিংবা ১৪ই আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবের বাসায় যাই। উনি ভাইস প্রেসিডেন্ট। পুরাতন গণভবনে থাকেন। তখন সন্ধ্যা হয়েছে। আমি দেখি উনি পাঞ্জাবি-লুঙ্গি পরে পায়চারী করছেন। সালাম দিলাম। কোনো উত্তর দিলেন না। খুব গম্ভীর। উনি তো এমনি একটু কানে কম শুনতেন। আর একবার সালাম দিলাম। তারও কোনো উত্তর নেই। বুঝলাম খুবই উত্তেজিত। নজরুল ভাইয়ের বাসায় প্রায় ডেইলি যেতাম। যখন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ছিল, রোজ বিকেলে গণভবনে গিয়ে ৪৫ মিনিট তাঁকে নিয়ে পায়চারী করতে হবে। সেখানেও যেতাম। শেষের দিকে তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটা মনে হয় ১৩ তারিখ দিনগত রাত্রে। চৌদ্দ তারিখ তো ওনার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। এদিকে সেদিন নজরুল ভাই গম্ভীর হয়ে চুপচাপ করে পায়চারী করছেন। আমিও ওনার সঙ্গে পায়চারী করছি। কোনো কথা বললেন না। নজরুল ইসলাম সাহেবকে আমরা সবাই শ্রদ্ধা করতাম। বঙ্গবন্ধুও ওনাকে স্যার বলতেন। মোশতাক, তাজউদ্দীন, কামারুজ্জামান বা মনসুর আলী সাহেবদের বঙ্গবন্ধু 'তুমি' করে বলতেন। কিন্তু সৈয়দ সাহেবকে তিনি 'আপনি' করে বলতেন, আমরাও স্যার বলতাম। তিনি খুব লার্নেড লোক ছিলেন।' [এম আর আখতার মুকুল, মুজিবের রক্ত লাল, পৃষ্ঠা- ২৫৪]

বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে আওয়ামী লীগে যোগদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করে ১৯৫৫ সালে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সবেমাত্র 'ময়মনসিংহ বারে' কাজ শুরু করেছেন। এ সময় আওয়ামী লীগে যোগ দিতে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে আহ্বান আসে। তিনি তাতে সাড়া দেন। এর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করেন সক্রিয় রাজনীতিতে। শুরু হয় তাঁদের যূথবদ্ধ পথচলা। দলীয় কাজে দুজন মিলে চষে বেড়িয়েছেন দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। শেখ মুজিবুর রহমানের বিশেষ আগ্রহেই রাজনৈতিক সফরে তাঁর সঙ্গে যেতেন সৈয়দ নজরুল।

১৯৫৭ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত দলীয় কাউন্সিলে খ্যাতিমানসাহিত্যিক ও পাকিস্তান সরকারের সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আবুল মনসুর আহমদকে পরাজিত করে ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি। এরপর দলীয় রাজনীতিতে আর পেছনে পড়ে থাকতে হয়নি তাঁকে। নিজ সাংগঠনিক দক্ষতার গুণে ১৯৬৪ সালে ইডেন চত্বরে অনুষ্ঠিত পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি নিযুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে হয়ে উঠেন জাতীয় নেতা।

কিশোরগঞ্জের বীর দামপাড়ার সন্তান সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেসময় ময়মনসিংহ শহরে বসবাস করলেও বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে যে কোনো প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে ছুটে যেতেন ঢাকায়। শেখ মুজিবুর রহমান যখনই কোনো জটিল রাজনৈতিক সমস্যায় আবর্তিত হতেন, তখন সমাধানের ভার পড়ত তাঁর ওপর। দুই নেতার মিলিত পরামর্শে বহু রাজনৈতিক সংকট সাফল্যের সাথে মোকাবেলা করা সম্ভব হয়েছে। এভাবেই তাঁদের মাঝে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

আন্দোলন সংগ্রামে ছিলেন পাশাপাশি

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে 'ছয় দফা' ঘোষণা দেন শেখ মুজিব। সারা পাকিস্তানে 'ছয় দফা' নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। এমন সময় বাঙালির মুক্তির সনদ 'ছয় দফা' নিয়ে দলের মধ্যে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সভা আহ্বান করেন। ১৯৬৬ সালের ১৮-১৯ মার্চ ঢাকার হোটেল ইডেন প্রাঙ্গণে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভা। দলের সভাপতি মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ উপস্থিত না হওয়ায় সভায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম সভাপতিত্ব করেন। এই কাউন্সিল সভায়ই 'ছয় দফা' অনুমোদন করা হয়। সভায় সারা বাংলায় শেখ মুজিবের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে নেতাকর্মীদের নির্দেশ দিয়ে তিনি নিজেও রাজপথে নামেন 'ছয় দফা' নিয়ে। দেশব্যাপী 'ছয় দফা'র পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে জনমত গড়ে তুলতে কাজ করেন সৈয়দ নজরুল। তখন শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদসহ অন্য জাতীয় নেতৃবৃন্দকে বারবার গ্রেফতার করে তাদের ওপর জুলুম-নির্যাতন চালানো হয়। সেই সংকটময় মুহূর্তে ১৯৬৬ সালের ৯ মে সৈয়দ নজরুল ইসলাম পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নিষ্ঠার সাথে সে দায়িত্ব পালন করেন ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত, সে সময় বাঙালির মুক্তির আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে কার্যকর ভূমিকা রাখেন তিনি। ১৯৬৮ সালে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামের একটি তথাকথিত রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দায়ের করা হয়। সেই মামলায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম শেখ মুজিবুর রহমানের অন্যতম আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল 'ডেমোক্র্যাটিক অ্যাকশন কমিটি' নামে একটি সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠন করে। তিনি এ কমিটির গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে সম্মিলিত নেতৃত্বের অগ্রভাগে চলে আসেন। তিনি 'ডেমোক্র্যাটিক অ্যাকশন কমিটি'র আট দফা এবং ছাত্রসমাজ ঘোষিত ১১ দফা কর্মসূচির মাঝে খুবই দক্ষতার সাথে সমন্বয় সাধন করেন। সে সময় রাজনৈতিক অস্থিরতা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। এ অচলাবস্থা নিরসনের জন্য রাওয়ালপিন্ডিতে ১৯৬৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি এবং পরে ১০-১৩ মার্চ দু দফা বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে পাক সরকারের যে গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, তাতে তিনি আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দলের অন্যতম নেতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

আইয়ুব শাসনামলের অধিকাংশ সময় শেখ মুজিব কারারুদ্ধ ছিলেন। তাঁকে বারবার গ্রেফতার করা হতো। এ সময় একবার এক সাংবাদিক মোনায়েম খানকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'শেখ মুজিবকে বারবার আটক করলেও সৈয়দ নজরুলকে কেন আটক করেন না?' মোনায়েম খান বলেছিলেন, 'আমি চাই না ময়মনসিংহ অঞ্চলে আর এক মুজিবের উত্থান ঘটুক।'

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে পতন ঘটে আইয়ুব খানের। সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলনের মুখে ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করে।

১৯৭০ সালের ৪-৫ জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন মতিঝিল ইডেন হোটেল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সভাপতি ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। এছাড়া ১৯৭০ সালের ৫ জুন জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে দলের মনোনয়ন দেয়ার জন্য একটি পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদসহ অন্য নেতৃবৃন্দের সাথে সেই পার্লামেন্টারি বোর্ডের অন্যতম সদস্য ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

সৈয়দ নজরুল ১৯৭০-এর নির্বাচনে ময়মনসিংহ-১৭ আসন থেকে এমএনএ নির্বাচিত হন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেই ঐতিহাসিক নির্বাচনে জয়লাভের পর আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের উপনেতা নির্বাচিত হন। সে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বাংলার মানুষের রায়ে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়।

১৯৭১ সালের আন্দোলন-সংগ্রামেও সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন অগ্রগামী। ১৯ মার্চ ১৯৭১ ইয়াহিয়া প্রাদেশিক পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের সাথে বৈঠক করেন। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে

আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম

সে প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতারের পূর্বেই দলীয় হাইকমান্ড গঠন করে গিয়েছিলেন। সৈয়দ নজরুল ছিলেন দলীয় হাইকমান্ডের প্রধানতম নেতা। ২৫ মার্চ দুপুরবেলা শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান ডিএফআই চিফ মারফত গোপন খবরে অবগত হন যে, রাতে ঢাকায় ক্র্যাকডাউন হতে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু দ্রুত হাইকমান্ড এবং অন্য নেতাদের গোপন আশ্রয়ে যাবার নির্দেশ দেন। নিজে রয়ে যান ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাড়িতে। ২৫ মার্চ রাতে শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হলে সৈয়দ নজরুল ইসলাম আবারও আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা

২৫ মার্চ রাতে আওয়ামী লীগ নেতারা যে যার মতো করে আত্মগোপনে চলে যান। কেউ কারো সঙ্গে যোগাযোগ করার সুযোগ পাননি। সেদিন রাতে সৈয়দ নজরুল ইসলামও আত্মগোপন করেন। এরপর ঢাকা থেকে বের হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট দিয়ে সীমান্ত পার হয়ে ১১ এপ্রিল ভারতে পৌঁছান তিনি। সেদিন একটি ছোট বিমানে চড়ে দু'দেশের সীমান্তসংলগ্ন বিভিন্ন জায়গায় নেমে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের খোঁজখবর নিচ্ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। ময়মনসিংহ সীমান্তে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে বিশেষভাবে খোঁজ করার জন্য আগেই খবর দিয়ে রাখায়, এ সময় বিএসএফের স্থানীয় এক অফিসার জানান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও এমপি আব্দুল মান্নানের সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন।
অতঃপর জিপে করে আবদুল মান্নান ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলকাতায় পৌঁছান। সেখানেই নজরুল ইসলামের সাথে তাজউদ্দীন আহমদের দেখা হয়। তিনি তাজউদ্দীন আহমদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করেন। বিদ্যমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হন।
১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয় বর্তমান মেহেরপুর জেলার ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথতলায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে বৈদ্যনাথতলার নামকরণ করা হয় মুজিবনগর। যে কারণে এই সরকারকে মুজিবনগর সরকার বলা হয়ে থাকে। আবার এই সরকারের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের বাইরে থেকে পরিচালিত হয়েছিল বলে এই সরকারকে 'প্রবাসী সরকার' হিসেবেও অভিহিত করা হয়। মুজিবনগর হয়ে ওঠে বাংলার অস্থায়ী রাজধানী।
১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর ১০ এপ্রিল এ সরকার

গঠিত হয়। পরে ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে।
পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকায় সেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে না পারলেও তাঁকেই করা হয় মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি। আর সৈয়দ নজরুল ইসলামকে করা হয় উপরাষ্ট্রপতি।
একই সাথে তাঁকে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্বও পালন করতে হয়। সশরীরে অনুপস্থিত থেকেও বঙ্গবন্ধুর ছিল সর্বত্র সরব উপস্থিতি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামেই চলেছে সরকার, পরিচালিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ। 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু', 'আমার নেতা, তোমার নেতা শেখ মুজিব, শেখ মুজিব' স্লোগানে সরব ছিল বাংলার রণাঙ্গন।
৬ জুলাই ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ পরিষদ সদস্যবর্গের সমাবেশে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাঁর ভাষণে বলেন, 'মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আপনারা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি, বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ বিশ্বাস করে তাদের দায়িত্ব আপনাদের অর্পণ করেছিল। আপনারা সবাই বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক বই আর কিছুই নন। আমাদের মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘদিনের সহচর হিসেবে তাঁর জীবনব্যাপী আদর্শ আর সংগ্রামের আমরা ধারক ও বাহক। আদর্শের জন্য, নীতির জন্য, নেতার কাছে আর বাংলার মানুষের কাছে দেওয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য এই ধরনের অটুট মনোবল আর কোনো দেশের জনপ্রতিনিধিরা দেখাতে পেরেছেন কিনা তার নজির আমার জানা নেই। আপনাদের বীরত্ব, আদর্শ, নিষ্ঠা, মনোবল ও ত্যাগের জন্য আমি অভিনন্দন জানাই। আপনারা গৃহহারা সর্বহারা হয়ে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করেছেন- তাই আপনাদের প্রতি আমার অকুণ্ঠ আন্তরিক সালাম আর অভিনন্দন।'
'বন্ধুরা আমার, নির্বাচন উত্তরকালে রমনার রেসকোর্স ময়দানে আমাদের মহান নেতা আমাদের শপথ বাণী উচ্চারণ করিয়েছিলেন। সেদিন সাক্ষী ছিল রেসকোর্স ময়দানের লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী জনতা আর বাংলার নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষ। আমি আজ গর্বের সঙ্গে বলব মহান নেতার হাত ধরে আমরা যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম সে প্রতিজ্ঞায় আমরা অটুট এবং অটল রয়েছি। আপনাদের অসীম মনোবল বিগত কয়েক মাস যাবৎ স্বাধীনতা সংগ্রামকে জিইয়ে রেখেছে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এই কথা বলতে হবে আমাদের যেসব বীর সৈনিক, মুক্তিফৌজের যে তরুণ সংগ্রামীরা মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছেন তাঁদের অপূর্ব বীরত্ব বাংলার মানুষের জন্য এক গর্বের বস্তু। আর ভবিষ্যৎ ইতিহাসের জন্য তা এক অপূর্ব বীরগাথা'।
মুক্তিকালীন সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাঁর নেতা 'বঙ্গবন্ধু'কে বারবার স্মরণ করেছেন। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের পর সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রধান প্রশ্ন ছিল সরকারের প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোথায়? জবাবে সদ্য গঠিত মুজিবনগর সরকারের উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম দৃঢ়চিত্তে বলেন, আমরা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই মন্ত্রিসভা গঠন করেছি। তার সাথে আমাদের চিন্তার (বিস্তর) যোগাযোগ রয়েছে।
১৯৭১ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, বন্ধুরা আমার, রক্তের আখরে লেখা, এই সংগ্রামের ইতিহাসের সাফল্যের এ ক্রান্তিলগ্নে আজ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি বাঙালি জাতির পিতা জনাব শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্বাধীনতার এ উষালগ্নে আজ তিনি আমাদের মধ্যে নেই। বর্বর জঙ্গিশাহীর কারাগারে আজ তিনি আবদ্ধ। আমরা জানি না, অন্ধকার কারাগারে কি দুঃসহ জীবন তিনি যাপন করছেন। বাংলাদেশের মানুষ, বাংলাদেশের বীর মুক্তিবাহিনী, আমরা সবাই যাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত, আর যাঁর আদর্শকে রূপ দেওয়ার জন্য আজকের এই সংগ্রাম চলছে এবং চলবে-সেই মহান নেতাকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং করে যাবো। যে হানাদার দস্যুরা বাংলার নয়নমণিকে কারাগারে আজও আবদ্ধ রেখেছেন, তাদের কাছে আমি বলতে চাই, সাড়ে সাত কোটি বাঙালির দুর্জয় সাহস আর প্রতিজ্ঞা যেমন অস্ত্রের ভাষায় রুদ্ধ করা যায়নি, তেমনি করে বাংলার অবিসংবাদিত নেতাকে কারাগারে রেখেও তারা নিস্তার পাবেন না।
প্রিয় দেশবাসীর কাছে আমি, আমার সরকারের তরফ থেকে আশ্বাস দিচ্ছি, বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য চেষ্টা করছি, সেই চেষ্টা চালিয়ে যাবো। কেননা আমরা মনে করি, বঙ্গবন্ধুকে ফেরত না পেলে বাংলাদেশের মানুষের কাছে এই স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করা সম্ভবপর হবে না'।
এভাবেই বাঙালি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে সামনে রেখে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী এক মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

স্বাধীন দেশের সরকারে একসাথে

২২ ডিসেম্বর ১৯৭১। বিকেল ৪টা ৫৫ মিনিট। কলকাতা থেকে আগত একটি ভারতীয় বিমান অবতরণ করল ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দরে। শীতের সেই বিকেলে একে একে বিমান থেকে নেমে এলেন মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও মন্ত্রিসভার সদস্য ক্যাপ্টেন (অব.) এম মনসুর আলী, এএইচএম কামারুজ্জামানসহ অন্যান্য নেতা। দেশে ফিরে বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত প্রথম সংবাদ সম্মেলনে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়ার জন্য ভুট্টোর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিকে এক মিনিটও আটক রাখার অধিকার ভুট্টোর নেই। ভুট্টো যদি জনগণের ভালো চান তাহলে তার বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেয়ার মত বাস্তব মনোভাব ও সাহসিকতা থাকা প্রয়োজন। তিনি বঙ্গবন্ধু'র মুক্তির জন্য চাপ সৃষ্টি করতে বিশ্বসংস্থাগুলোর প্রতি আহ্বান জানান।
অবশেষে পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালে দেশে ফিরে সরকার পুনর্গঠন করে বঙ্গবন্ধু সৈয়দ নজরুল ইসলামকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের উপরাষ্ট্রপতি শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়ে সন্তুষ্টচিত্তে কাজ করেছেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল করতে, লক্ষ লক্ষ বেকার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তিনি নতুন নতুন শিল্পকারখানা স্থাপন করেছেন। ছুটে বেড়িয়েছেন দেশের এ-প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে।
এই সময়ে বঙ্গবন্ধু'র নির্দেশে তিনি সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। এবং জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের উপনেতা নির্বাচিত হয়ে সংসদের ভেতরেও সক্রিয় ছিলেন সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে।
স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ প্রথম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সে সময় ৩০০ আসনে সরাসরি নির্বাচন হয়। আর সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ছিল ১৫টি। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯৩টিতে জয়লাভ করে। বঙ্গবন্ধু সে সময় ঢাকা-১২ আসন আর সৈয়দ নজরুল ইসলাম ময়মনসিংহ-২৮ আসন থেকে বিজয়ী হয়েছিলেন।
১৯৭৫ সালে বাকশাল গঠিত হলে সৈয়দ নজরুল ইসলামের পলিটব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত হন। এছাড়া বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটির ১১৫ জন সদস্যবিশিষ্ট কমিটির তিনি ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।
১৯৭৫ সালে সরকারে পরিবর্তন আসলে সৈয়দ নজরুল ইসলাম আবারও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বঙ্গবন্ধু সরকারে সবসময় সৈয়দ নজরুলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ছিল। এই সময়ের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যতবার বিদেশে গিয়েছেন ততবার ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রীরও দায়িত্ব পালন করেছেন সৈয়দ নজরুল। এর মধ্য দিয়ে এটিও সুস্পষ্টভাবে এটা বোঝা যায় যে, সৈয়দ নজরুল ইসলাম বঙ্গবন্ধু'র কতটা কাছের ও বিশ্বস্ত ছিলেন।

আমৃত্যু রাজনৈতিক সহকর্মী

রাজনীতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম যেমন বাংলার মানুষের ভালোবাসা পেয়েছেন, তেমনি পেয়েছেন বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভালোবাসাও। বঙ্গবন্ধু তাঁকে বন্ধু বলে পরিচয় দিতেন। তাঁকে সম্মান করতেন। তিনি ছিলেন জাতির পিতার বিশ্বস্ত সহচর, সহযোদ্ধা। বঙ্গবন্ধু যেমনটা তাঁকে বিশ্বাস করতেন, সেই বিশ্বাসের মর্যাদা তিনি জীবন দিয়ে অক্ষুণ্ন রেখেছেন। আর তা পেরেছেন এজন্য যে তিনি ছিলেন নীতির প্রশ্নে আপসহীন। তিনিই বাংলার মানুষের প্রাণের বুলবুল-সৈয়দ নজরুল ইসলাম। বাংলার মানুষ তাঁকে ভালোবেসে স্লোগান তুলত- বাংলার বুলবুল, সৈয়দ নজরুল। বাংলার সেই বুলবুলকেই বঙ্গবন্ধু অনেক আপন করে নিয়েছিলেন। তাঁদের যৌথ যাত্রার তিন দশকের [১৯৪৭-১৯৭৫] ইতিহাস অন্তত তাই বলে।